উচ্চশিক্ষার নামে বেপরোয়া বাণিজ্য

তারিখ 21 SEP 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২
কালের কণ্ঠ

আজিজুল পারভেজ ▶

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

- একটিও স্থায়ী সনদ পায়নি
- ৪০টির নেই স্থায়ী ক্যাম্পাস
- ৫২টির নেই কোষাধ্যক্ষ, চলছে অবৈধ লেনদেন
- একটির নামে ১০৭টি অবৈধ ক্যাম্পাস
- সার্টিফিকেট নিয়ে বিপাকে শিক্ষার্থীরা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়মনীতির কোনো তোয়াক্কা করছে না। অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে কার্যক্রম পরিচালনার কথা থাকলেও অধিকাংশই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার অনুমোদিত কোনো কোষাধ্যক্ষ নেই, সেগুলোতে আর্থিক লেনদেন চলছে অবৈধভাবে। প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে স্থায়ী সনদ অর্জনের কথা থাকলেও বিগত ২১ বছরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও তা অর্জন করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছরের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার কথা থাকলেও এই শর্ত পূরণ করতে পেরেছে মাত্র ১২টি প্রতিষ্ঠান। ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই স্থায়ী ক্যাম্পাস।

৯টি বিশ্ববিদ্যালয় দিনের পর দিন অবৈধ কার্যক্রম চালাচ্ছে আদালতের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা নিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে অননুমোদিত ক্যাম্পাস, অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস খুলে সার্টিফিকেট বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ। কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়াই সরকারের সঙ্গে যুক্তি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০১০ সালে সংশোধন করে স্থায়ী হওয়ার সময়সীমা সাত বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থায়ী সনদের শর্ত হিসেবে শিক্ষার পরিবেশ উপযোগী নিজস্ব ক্যাম্পাস ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, শতকরা তিন ভাগ অনুন্নত অঞ্চলের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থী ও তিন ভাগ মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে বিনা মূল্যে পড়ানো, বার্ষিক বাজেটের পর্যাপ্ত অর্থ গবেষণা খাতে ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

২০১০ সালে আইন সংশোধনের আগে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ৫২ বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এর মধ্যে একটিও সব শর্ত পূরণ করে স্থায়ী হতে পারেনি। এ পর্যন্ত মাত্র ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পেরেছে। বাকিগুলোর অধিকাংশই রাজধানীর বাণিজ্যিক এলাকায় বিশেষ করে ধানমন্ডি, বনানী এবং আশপাশ এলাকার বাণিজ্যিক ভবনে অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব ক্যাম্পাসে আংশিক কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের নামে কেনা জমিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে চারটি। নির্মাণাধীন আছে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। ভবন নির্মাণের নকশার অনুমোদন নিয়েছে কিন্তু নির্মাণকাজ শুরু হয়নি এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে তিনটি। জমি আছে কিন্তু নির্মাণের প্রস্তুতি নেই এমন আছে ১৮টি। কোনো জমি ক্রয়ই করেনি পাঁচটি। একটি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকানা দ্বন্দ্বে চার ভাগে বিভক্ত হওয়ায় এ-সংক্রান্ত কোনো তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এসব বিশ্ববিদ্যালয় চলছে সাময়িক অনুমতির ভিত্তিতে। সাময়িক অনুমতির সময় পাঁচ বছর শেষ হয়ে গেলেও নবায়নের জন্য কিংবা স্থায়ী সনদের জন্য এরা আবেদন করেনি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এ বলা হয়েছে, সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদের মধ্যে সনদের জন্য আবেদন করতে ব্যর্থ হলে অথবা সনদপত্রপ্রাপ্তির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ও শিক্ষাসংক্রান্ত সব কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় শর্ত পূরণ না করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এক বছরের মধ্যে তা পূরণের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। না হলে আগামী বছর (২০১৪) ছাত্রভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সতর্ক করা হয়েছে। ওই সভার পর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী সনদের জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে বলে জানা গেছে। এক্ষেত্রে নতুন অনুমতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বরং এগিয়ে রয়েছে। ২০১২ সালে অনুমতি পাওয়া দুটি বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রাই করেছে নিজস্ব ক্যাম্পাসে।

৫২ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই কোষাধ্যক্ষ, চলছে লোপাট : চলতি মাসে অনুমতিপ্রাপ্ত দুটি বাদ দিয়ে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭১টি। এর মধ্যে ৫২টিতে নেই সরকার মনোনীত কোষাধ্যক্ষ, ১৬টিতে নেই উপাচার্য আর ৫১টিতে নেই উপ-উপাচার্য। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম থমকে থাকার কথা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা বা বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) সদস্যদের ইচ্ছায় চলছে এগুলোর আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। কোষাধ্যক্ষবিহীন আর্থিক কার্যক্রম চলছে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়। উদ্যোক্তারা বাণিজ্যিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের মতো করে এসব চালাচ্ছেন। শিক্ষাবিদ-উপাচার্য, উপ-উপাচার্য থাকলে তাঁরা সাধারণত শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করেন না। সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, পাঠক্রম কমিটি, অর্থ কমিটি, শৃঙ্খলা কমিটি, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি ইত্যাদিতে ভূমিকা রাখেন।

আইন (২০১০) অনুসারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের জন্য উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটি প্রতিটি পদে তিনজনের প্যানেল প্রস্তাব করে। রাষ্ট্রপতি সেই প্যানেল থেকেই চূড়ান্ত মনোনয়ন দেন। কিন্তু একশ্রেণীর উদ্যোক্তা নিজেদের স্বার্থে আইনানুগ উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কারণ চ্যান্সেলরের নিয়োগ করা কর্মকর্তাকে চাইলেই অপসারণ করা যাবে না। কিংবা নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা নাও যেতে পারে। তা ছাড়া শিক্ষাবিদ-কোষাধ্যক্ষ থাকলে ইচ্ছামতো অর্থ লোপাট সম্ভব নাও হতে পারে। কোষাধ্যক্ষবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিওটির প্রতিনিধিরাই ইচ্ছামতো আর্থিক হিসাব পরিচালনা করছেন। অথচ আইন অনুসারে কোষাধ্যক্ষ ও বিওটির একজন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার কথা। আবার যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ রয়েছেন, সেগুলোতেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একই উপাচার্য চালাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাই শিবলী বলেন, উপাচার্য ছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। তাঁকে সহযোগিতা করবেন উপ-উপাচার্য। আর কোষাধ্যক্ষ ছাড়া আর্থিক লেনদেন হতে পারে না। অথচ অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে কোষাধ্যক্ষ ছাড়া। এদের আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ রয়েছে। তিনি জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে একটি পদে একজন ব্যক্তিকে দুই মেয়াদের বেশি না রাখার বিধান যুক্ত করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয় শাখা) কাজী সালাউদ্দিন আকবর বলেন, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষ কর্মকর্তা নেই তার তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সে অনুসারে অবিলম্বে তাঁদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নোটিশ পাঠানো হবে।

চলছে অবৈধ বাণিজ্য : অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অননুমোদিত ক্যাম্পাস ও অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে সার্টিফিকেট বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আদালতের সাময়িক স্থগিতাদেশ নিয়ে দিনের পর দিন এই অবৈধ বাণিজ্য চালাচ্ছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষা-বাণিজ্য' এতই জমজমাট হয়ে উঠেছে এগুলোর মালিকানার দখলদারিত্ব নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কয়েকটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রুপগুলো পৃথক পৃথকভাবে সারা দেশে আউটার ক্যাম্পাস স্থাপন করে শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এ রকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মার্কুলি ইহসান ইউনিভার্সিটি। ১৯৯৩ সালে যাত্রা করা এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন মালিকানা দ্বন্দ্বে চার গ্রুপে বিভক্ত। তাদের সারা দেশে ১০৭টি আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ ক্যাম্পাসগুলোতে যাঁরা পড়ালেখা করেছেন তাঁরা এখন বিপাকে পড়েছেন। এখানকার আইনের সনদধারীরা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার কাউন্সিলের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। একইভাবে 'লাইব্রেরি সায়েন্স ডিপ্লোমা' যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে চার হাজার ৬৮৫ জন বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে চাকরি পেয়ে গেলেও এখন এমপিওভুক্ত (বেতনের সরকারি অংশের জন্য) হতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁদের সনদ গ্রহণ করছে না। তাঁদের নতুন করে সনদ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। মালিকানা দ্বন্দ্বে জর্জরিত আরেকটি হচ্ছে স্টাডিজ দীপন্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এর উদ্যোক্তা হচ্ছেন বিএনপি মনোনীত সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহাম্মদের স্ত্রী অধ্যাপক আনোয়ারা বেগম। তিনি উপাচার্যও ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাঁর সঙ্গে উপ-উপাচার্যের দ্বন্দ্বের সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির মালিকানায় দখল নিয়েছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয় এখন দুই গ্রুপে বিভক্ত। মালিকানার দ্বন্দ্ব কিংবা আদালতের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আরো রয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি।

অন্তত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যারা আইন-কানুনকে তোয়াক্কা না করে রাজধানীতেই অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এর মধ্যে প্রাইম ইউনিভার্সিটি মিরপুর, ধানমন্ডি, বারিধারা, ফার্মগেটসহ কয়েকটি স্থানে, নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ কারওয়ানবাজার ও মিরপুর রোডে (ঢাকা কলেজের বিপরীতে) এবং স্টাডিজ দীপন্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিপলস ইউনিভার্সিটি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ বিভিন্ন স্থানে অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় পুলিশ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

অসহায় ইউজিসি : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় জনপ্রিয় বিভাগ খুলে নামমাত্র মূল্যে সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। আবার সুনাম অর্জন করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করছে ইচ্ছেমাফিক ফি। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসির অনুমোদন ছাড়াই সামর্থ্য নেই-এমন বিভাগ খুলে 'বাণিজ্য' চালাচ্ছে। এসব ব্যাপারে নেই কোনো নজরদারি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেখভালের দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই এই প্রতিষ্ঠানের। ইউজিসিকে রূপান্তর করে উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা কমিশন আইনটি অনুমোদনের জন্য বর্তমানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে রয়েছে। শিগগিরই তা মন্ত্রিসভার বৈঠকে উঠতে পারে বলে জানা গেছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী জানিয়েছেন, উচ্চ শিক্ষা কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণের অনেক বিষয়েই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২